প্রমীলা
স্মৃতিকথা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ

পঞ্চম খণ্ড

সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত
৫ জন লেখিকার ৫টি স্মৃতিকথা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
	প্রমীলা-কথা	ড. বিজিত ঘোষ	০৯
১।	আমার জীবন-কাহিনি	আমোদিনী দাশগুপ্ত	২৩
২।	সংসারী রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	হেমলতা ঠাকুর	৪৯
৩।	জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরি	মনোদা দেবী দাশগুপ্তা	৭৩
৪।	জাপানে বঙ্গনারী	সরোজনলিনী দত্ত	১১৫
৫।	স্মৃতির পাতা	সৈয়দ মনোয়ারা খাতুন	২১৭

প্রমীলা-কথা

আমোদিনী দাশগুপ্ত (১৮৭৩—১৯৩৯)

বাংলাদেশের খুলনা জেলার উজিরপুর গ্রামে, মামার বাড়িতে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে আমোদিনী দাশগুপ্তের জন্ম হয়। তবে তাঁর পিতৃগৃহ ছিল খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে।

এগারো বছর বয়সে আমোদিনী পিতৃহারা হন। ঠিক তার আগেই আমোদিনীর বিবাহ হয় বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের চন্দ্রকুমার কবিভূষণের সঙ্গে, চতুর্থ পক্ষে। চন্দ্রকুমারের বয়স তখন তেতাল্লিশ : আমোদিনীর সদ্য এগারো। ইতিপূর্বে তিনটে বিয়ে করেছেন চন্দ্রকুমার। প্রথম পক্ষের ছিল দুই পুত্র এবং তৃতীয় পক্ষের একটি পুত্র। এ হেন পাত্রের সঙ্গে আমোদিনীর মা, তাঁর ছেলের আপত্তি সত্ত্বেও আমোদিনীর বিবাহ দেন; শুধুমাত্র অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়।

চন্দ্রকুমারের পিতামহ মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র উনিশ শতকের সূচনাপর্বে নিজের বাড়িতে টোল স্থাপন করে শিক্ষা দিতেন। 'কবীন্দ্র' উপাধিটি তারপর থেকে বংশপরম্পরাগত হয়ে দাঁড়ায়। আয়ুর্বেদচর্চায় এই পরিবারের বিশেষ খ্যাতি ছিল। আমোদিনীর স্বামী চন্দ্রকুমার ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য ও বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের রাজবৈদ্য। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা' বাংলায় ও 'রাজ্যাভিষেকপদ্ধতি' সংস্কৃতে রচনায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

'আমার জীবন কাহিনী' নামে আমোদিনী একটি স্মৃতিকথা রচনা করেন। সেটি নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৯৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। আমোদিনী দাশগুপ্তের ব্যক্তিপরিচয় বিশদে পাওয়া যায় না। তাঁর সামান্য তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল 'এক্ষণ' পত্রিকায় আমোদিনী দাশগুপ্তের 'আমার জীবন কাহিনী' প্রকাশের সময়। (তথ্যসূত্র : 'রচনাপরিচয়', মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, এক্ষণ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৭)

পরবর্তীকালে আমোদিনী দাশগুপ্তের 'আমার জীবন কাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন অভিজাত প্রকাশনী 'সুবর্ণরেখা' (প্রসন্নময়ী আমোদিনী : ফিরে দেখা ১, 'সুবর্ণরেখা')।

ঘর আর বাইরে মেয়েদের অবস্থার অনেকাংশ জুড়েই আপাত স্ববিরোধের আবহ বজায় থাকছে এই পুরো সময় জুড়েই। সম্পর্ক, ভালোবাসা, দায়িত্ব ইত্যাদির মোচড়গুলি বেশিরভাগ সময়েই তৈরি হচ্ছে গোষ্ঠী বা সমাজ কী চাইছে তার ওপর ভিত্তি করে। আধুনিকের আবহে মা-মেয়ের সম্পর্কেও ছায়া ফেলছে নিক্তিমাপা দাবি-দাওয়া। আমোদিনী দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'আমার মা বড়ো টাকা ভালোবাসিতেন। আমার যে সময়, সে সময়ে মেয়ে বেচিয়া টাকা লইবার নিয়ম ছিল। কুলীনের মেয়ে হইলে তো কথাই ছিল না।... এক হাজার টাকা পণ লইয়া আমার মা এগারো বৎসরের মেয়েকে (আমোদিনী) তেতাল্লিশ বৎসর বয়সের চতুর্থ পক্ষের বরের নিকট বিক্রি করে।'

উনিশ শতকের বাংলাদেশে এ ধরনের মায়েরও সন্ধান মেলে। সন্তান খারাপ হলেও মা কখনও খারাপ হয় না—বাংলার এই প্রবচন এক্ষেত্রে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল।

আমোদিনী লিখছেন : '...আমি কুলীনের মেয়ে, তাহাতে চতুর্থ পক্ষে আমাকে দিয়া তো প্রচুর টাকাই পাইবার আশা। ...আমার মা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ...সাতশত টাকা পণ লইয়া বিবাহের দিন ধার্য করিলেন.... বাবা মারা গেলে (আমোদিনীর পিতা সে সময় খুবই অসুস্থ ছিলেন।) পাছে বিবাহ বন্ধ হয়, ইহা মনে করিয়াই আমাকে পাত্রের বাড়ি পাঠানো হয় এবং পিতার পূর্বপুরুষের নিয়মের অন্যথা করিয়া আমাকে পাত্রের বাড়ি পাঠাইয়াছেন বলিয়া পাত্রের নিকট (মা) আরও তিনশত টাকা দাবি করেন। আমার বিবাহার্থী ভদ্রলোক বাধ্য হইয়া সে তিনশত টাকা মাকে দেন, সুতরাং আমার দান (দাম?) হইল এক হাজার টাকা।'

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আমোদিনী দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

হেমলতা দেবী ঠাকুর (১৮৭৪—১৯৬৭)

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হেমলতা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। হেমলতার বিবাহ হয় রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্নী হেমলতা ছিলেন নিঃসন্তান। অন্যদিক থেকে হেমলতা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী। প্রথমা পত্নী সুশীলা দেবীর মৃত্যুর (১৯ মার্চ, ১৮৯১) মাত্র এক মাস পাঁচ দিন পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন, ২৩ এপ্রিল, ১৮৯১। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'আমার খুড়োজ্যাঠাদের কারো কারো বেশ কম বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করেননি। অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে ভাইয়েরা বেশি কালক্ষেপ না করেই অনায়াসে নতুন বউ ঘরে আনতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমার মা [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] দ্বিপুদাদার প্রথম স্ত্রী সুশীলা বৌঠানকে খুব ভালোবাসতেন; তাই বড়দা যখন মোহিনীমোহন চাটুয্যের বোন হেমলতা দেবীকে স্ত্রীবিয়োগের অল্প দিন পরেই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে আনলেন, তখন মা তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথাই কইলেন না।...'

আত্মীয়তাসূত্রে হেমলতা তাঁর বিবাহের আগে থেকেই ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া আসা করতেন, রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। বিবাহরাত্রে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা, স্ত্রীর অসুখ ও মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা ইত্যাদি অনেক অন্তরঙ্গ চিত্র হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে পাওয়া যায়।

বিবাহের পর তাঁকে ইংরেজি শেখাবার জন্য দ্বিপেন্দ্রনাথ মিস ম্যাকস্কল নামক একজন স্কটিশ মহিলাকে নিয়োগ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৮৯৯) পর পারিবারিক ধর্মালোচনার সময় তাঁর আগ্রহ দেখে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন দুপুরে তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা করে ধর্মালোচনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির প্রতি আস্থার নিদর্শনস্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে মৃত্যুর আগে তাঁর নিজের দীক্ষার আংটিটি দিয়ে যান। তারপর শান্তিনিকেতনে যখন তাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে দু-বছর নিয়মিত ইংরেজি পড়িয়েছিলেন পিয়র্সন। অ্যান্ড্রুজের কাছেও পাঠ নিয়েছেন ইংরেজি কবিতার। হেমলতা বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার সুর দিয়েছেন। আজকের দিনে তাঁর কবিতা অতিতরল বলে মনে হবে, অবশ্য, তবে বিংশ শতকের প্রথম দশকে তা বেমানান ছিল না। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই আমরা জানতে পারি, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ সারারাত ছাদে পায়চারি করে কাটিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের প্রায় গোড়া থেকেই দ্বিপেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দেবী সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি 'বড়োমা' নামে পরিচিত ছিলেন। তবে দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথম পত্নী সুশীলার পুত্র ও কন্যা, দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনী তাঁকে ডাকতেন 'ছোটমা' বলে। নলিনী দেবীর ছেলেরাও তাঁকে 'ছোটমা' বলে ডাকতেন। স্বামী (১৯২২) ও শ্বশুরের (১৯২৬) মৃত্যুর পর হেমলতা কিছুদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে, তারপর ম্যাকলাউড স্ট্রিটে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে বাস করেন। দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর জন্য উইলে ২০০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে ছোটো ছেলেদের পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। অবসর সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ বা অজিতকুমার চক্রবর্তী বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণও করেছেন। তখনও শান্তিনিকেতনে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। হেমলতা এই সময়ে ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছেন। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে কালে নানা ধরনের লেখাপড়ার কাজ করাতেন। বিদেশি পত্রিকার রচনার সারমর্ম তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিজে সংশোধন করে *প্রবাসী*-তে ছাঁপতে পাঠাতেন; সুফি ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদের কাজেও তাঁকে লাগিয়েছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বিদেশে গিয়ে সেখানকার বর্ণনা দিয়ে তিনি নিয়মিত হেমলতাকে চিঠি লিখেছেন। তবে হেমলতার আলগা মেয়েলি কথা চালাচালি করবার অভ্যাস তাঁকে কখনো কখনো বিব্রত করেছে, মীরা দেবীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের অনেক কথা যেমন জানা যায়, তাঁর অনুসন্ধিৎসা মাঝে মাঝে সাধারণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে অসংযত হয়ে উঠত। একবার রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁকে পত্রে ভর্ৎসনা করেছিলেন এ জন্য। রবীন্দ্রনাথের হাজার হাজার চিঠির মধ্যে এই রকম কঠোর চিঠি খুবই কম :

> ..... এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! কাগজে নিজের লেখা বের করবার উগ্র উৎসাহে ঠাট্টা বোঝবার ক্ষমতাও তোমার লোপ পেয়েছে। প্রথমত মা আমাকে তেল মাখিয়ে কালো করে দিয়েছেন, একথা আমি যথার্থভাবে বিশ্বাসই করিনে। দ্বিতীয়ত তুমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানবচরিত্রে প্রবেশ করে নিজের বিচারের ছবি তার মধ্যে চালিয়ে দাও যদি, তাহলে তোমার এই সর্দারি যে মারাত্মক হয়ে উঠবে। অল্প কিছুদিন আগেই কোনো আলাপে এই বিপদের কথাই হচ্ছিল। একজন বলছিলেন বাইরের লোকদের দ্বারা আমার জীবনের বিকৃতি তত বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হবে না, যেমন হবে আত্মীয়দের দ্বারা। এখন দেখছি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া, চিঠিপত্র লেখা আমার পক্ষে আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠল। তেল মাখানো নিয়ে মায়ের উপরে অভিমান করে আছি, এত বড় হাস্যকর কথা তাদের পক্ষেই গম্ভীরভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব যাদের মাথায় হাস্যরসের

বোধ নেই। আমার বিপদ এই, সকলের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করা আমার স্বভাবসিদ্ধ। ইতি ৬-৪-৪০। কাকামশাই।

লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট শান্তিনিকেতনে এলে (১৯২১) তাঁর বাংলা ভাষাশিক্ষার ভার হেমলতার ওপরে অর্পিত হয়। এই বছর দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর ইচ্ছাপত্র স্বাক্ষর করেন—তাতে হেমলতা দেবীকে আজীবন মাসিক ১০০ টাকা এবং বাসস্থান 'নীচের বাংলা'র স্বত্ব দান করা হয়। পুত্রবধূ কমলের জন্য বরাদ্দ হয় মাসিক ২০০ টাকা। বিশ্বভারতীর সংবিধান রেজেস্ট্রি হলে (১৬ মে ১৯২২) অন্যান্য নানা সমিতির সঙ্গে যে নারীসমিতি গঠিত হয় তার অন্যতম প্রতিনিধি হন হেমলতা। দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৭ মে ১৯২২) পর তিনি শান্তিনিকেতনের কাজ ছাড়াও নারীসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আইসিএস গুরুসদয় দত্ত, তাঁর পত্নী সরোজনলিনীর মৃত্যু (১৯২৪) হলে তাঁর স্মৃতিতে 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' স্থাপন করেন। হেমলতা দেবীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে কমিটির প্রধান সদস্যের দায়িত্ব নিতে রাজি করান। গুরুসদয় দত্তের মৃত্যুর পর হেমলতা পুরী চলে গিয়ে সেখানে নারীমঙ্গল সমিতির বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের ভারগ্রহণ করেন, সেখানেই তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টায় তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। [তথ্যসূত্র : 'রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন'/সমীর সেনগুপ্ত]

হেমলতার বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতি পিতৃগৃহে এবং শ্বশুরালয়ে উভয় পরিবারেই সমান উৎসাহ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে হেমলতাকে কিছুদিন ইংরেজি শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিবাহের পর হেমলতার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেমলতা দেবী কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা লিখে যশস্বিনী হন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন হেমলতা দেবী। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'জ্যোতিঃ' কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় 'অকল্পিতা'। এই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আলোর পাখী' প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই মূলত ভগবৎ প্রেমে সিক্ত। হেমলতা রচিত প্রথম গল্প-গ্রন্থের নাম 'দুনিয়ার দেনা'। এটি প্রকাশ পায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি হেমলতা উৎসর্গ করেন শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসকে। দ্বিতীয় গল্প-গ্রন্থের নাম 'দেহলি'। প্রকাশকাল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। এ বইটির নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। হেমলতা দেবীর গল্প-গ্রন্থ দুটি পড়ে সেকালে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'দেহলি' পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটি পত্রও লিখেছিলেন। হেমলতার 'মেয়েদের কথা'-র প্রকাশকাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। এটি একটি প্রবন্ধ-পুস্তক। নারীসমস্যা নিয়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন। 'শ্রীনিবাসের ভিটা', 'দু'পাতা' ইত্যাদি গ্রন্থেরও রচয়িতা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ঠাকুর।

হেমলতা দেবী 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামের একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। সম্পাদিকা ছিলেন 'সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল' সমিতির-ও। এ ছাড়াও পুরীর 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম'- এর পরিচালিকাও ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যকীর্তির জন্য তাঁকে 'লীলা' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। এই পুরস্কার তিনিই প্রথম (১৯৫৪) পান।

ঠাকুরবাড়ির যে বধূ ও কন্যারা আশ্রম-বিদ্যালয়ের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে বিদ্যালয়ের

নানাবিধ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেসব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন তিনি। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সকলে তাঁকে ডাকতেন 'বড়োমা' 'বলে'। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়ে, অনুবাদ করিয়ে সেসব প্রকাশ করেছেন পত্রিকায়। হেমলতার ব্যক্তিত্ব বিকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদান আর তাঁর প্রতি হেমলতার শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে (১৩৭০ বঙ্গাব্দে) পুরীতে হেমলতা দেবী পরলোক গমন করেন।

হেমলতার পিতা ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় হলেন

...'রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবীর পুত্র। ...

...তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনীমোহন ও ভ্রাতুষ্পুত্র তপনমোহন সুলেখক ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যোগ নিবিড়। হেমলতার ভ্রাতা মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যা ও রজনীমোহন গুণেন্দ্রনাথের কন্যা চিত্রশিল্পী সুনয়নীকে বিবাহ করেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয় ষোলো বছর বয়সে। তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না কিন্তু মাতৃস্নেহে তিনি সপত্নীপুত্র ও কন্যা দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনীকে আপন করে নিয়েছিলেন।...

...ধর্মের প্রতি হেমলতার তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাঁর গুরু শিবনারায়ণ স্বামী। মহর্ষি তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে তৃপ্তি পেতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে তিনিই প্রথম আচার্যা। ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা করেছেন সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চা।...

...হেমলতার লেখা স্মৃতিকথাগুলি সবচেয়ে বেশি পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, মহর্ষি সকলকেই তিনি দেখেছেন খুব কাছে তাই তাঁদের কথা লিখতে কোনও অসুবিধে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর, সংসারী রবীন্দ্রনাথ, আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শ্বশুর মহাশয়, বাবা মহাশয়, মনের ছবি প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়াও হেমলতা লিখেছেন 'স্মৃতিচারণ' ও 'পুরাতন স্মৃতি'। দুটিতে নিজেকে যতদূর সম্ভব আড়ালে রাখার চেষ্টা করলেও এখানে হেমলতাকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। 'স্মৃতিচারণ' প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা'য়, 'পুরাতন স্মৃতি' সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ। বৃদ্ধ বয়সে হেমলতা ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সে দেশের নারীপ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হতে।...'

['অন্তঃপুরের আত্মকথা'/চিত্রা দেব]

হেমলতা দেবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন শ্রী সোমেন্দ্রনাথ বসু :

'...মহর্ষির জ্যেষ্ঠ নাতি দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী। 'বড়মা' নামে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। দীর্ঘ ৬৫ বছর কাল তিনি শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে অতিবৃদ্ধ বয়সেও পুরীতে নানারকম সমাজকল্যাণকর কাজে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। ১৩৭০ সালে পুরীতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর 'শ্বশুরমহাশয়' ও 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দুটি ১৩৪৬ সালের প্রবাসীতে, রবীন্দ্রনাথের "বিবাহ-বাসর" এবং 'মনের ছবি, সমকালীন-এ প্রকাশিত হয়।